রেলপথের ছন্দে উন্নয়ন: প্রগতির ট্র্যাকে বাংলাদেশ

রেজাউল করিম সিদ্দিকী

একটানা কু-ঝিক-ঝিক শব্দ, জানালার বাইরে দ্রুত পেছনে ছুটে চলা সবুজ-শ্যামল প্রান্তর, আর ট্রেনের হুইসেলের সেই চিরচেনা সুর রেলভ্রমণ যেন বাঙালির আবেগ ও স্মৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। শৈশবের রোমাঞ্চ, প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কিংবা দূরপথের যাত্রা রেলপথের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষের অগণিত গল্প।

তবে রেলওয়ের গুরুত্ব কেবল নস্টালজিয়া বা ভ্রমণবিলাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাদেশের অর্থনীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, আঞ্চলিক সংযোগ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় রেলওয়ে এক অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে আসছে। নদীমাতৃক ও ঘনবসতিপূর্ণ এই দেশে সাশ্রয়ী, নিরাপদ, জ্বালানি-সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব গণপরিবহণ হিসেবে রেলের বিকল্প খুবই সীমিত। প্রতিদিন লক্ষাধিক মানুষ কর্মস্থল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে রেলপথ ব্যবহার করেন, যা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশে রেলওয়ের ইতিহাস দীর্ঘ ও গৌরবময়। এ দেশের রেলযাত্রার সূচনা হয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে, ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর। সেদিন চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থেকে কুষ্টিয়ার জগতী পর্যন্ত মাত্র ৫৩.১১ কিলোমিটার রেললাইন চালুর মাধ্যমে উপমহাদেশের এই অঞ্চলে রেল যোগাযোগের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ শাসকেরা মূলত পাট, চা, নীলসহ বিভিন্ন কৃষি ও শিল্পপণ্য দ্রুত বন্দরনগরীতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রেলপথ সম্প্রসারণ করে। যদিও তাদের উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা, তবু সেই রেলপথই পরবর্তীকালে এ অঞ্চলের মানুষের যোগাযোগ, বাণিজ্য ও সামাজিক বিকাশের অন্যতম ভিত্তি হয়ে ওঠে।

দেশভাগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে রেলওয়ে বহু চড়াই-উতরাই অতিক্রম করেছে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় রেলওয়ের অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর নবগঠিত বাংলাদেশের জন্য রেলওয়ের পুনর্গঠন ছিল একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সীমিত সম্পদ ও নানা আর্থিক সংকটের মধ্যেও রেলপথ পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাব, অবকাঠামোর দুর্বলতা, আধুনিকায়নের ঘাটতি এবং সড়ক যোগাযোগের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার কারণে রেলওয়ে ধীরে ধীরে তার গুরুত্বের একটি অংশ হারাতে থাকে। অনেক রুটে ট্রেন চলাচল কমে যায়, পুরোনো লাইন ও কোচের কারণে যাত্রীসেবা ব্যাহত হয় এবং রেল খাত একপ্রকার অবহেলার শিকার হয়ে পড়ে।

তবে একবিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় রেলওয়ে আবারও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে শুরু করে। বিশেষ করে গত দেড় দশকে রেল খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ, দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা এবং আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজনের ফলে এ খাতে দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। নতুন রেললাইন নির্মাণ, ডাবল লাইন স্থাপন, আধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু, নতুন ইঞ্জিন ও কোচ সংযোজন, পুরোনো রেলপথ সংস্কার এবং আন্তঃনগর ট্রেনসেবার সম্প্রসারণ রেল যোগাযোগকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করে তুলেছে।

আজ বাংলাদেশের রেল নেটওয়ার্ক ৩ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি বিস্তৃত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে একটি সুসংহত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আনার পাশাপাশি রেলওয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, পণ্য পরিবহন এবং আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রাজধানী ঢাকা থেকে দেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে দ্রুত ও নিরাপদ যোগাযোগ নিশ্চিত করতে রেলপথ ক্রমেই একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বর্তমান সময়ে

রেলওয়ে শুধু একটি পরিবহণব্যবস্থা নয়; বরং এটি জাতীয় উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি। একসময় যে রেলওয়ে অবহেলা ও সংকটের প্রতীক ছিল, আজ তা আধুনিক বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার এক শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করছে।

বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ ও দ্রুত উন্নয়নশীল একটি দেশে কার্যকর, সাশ্রয়ী এবং টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে রেলওয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, নগরায়ণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারের ফলে সড়কপথের ওপর চাপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই চাপ কমিয়ে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় যাতায়াত নিশ্চিত করতে রেলের কোনো কার্যকর বিকল্প নেই। প্রতিদিন লাখো মানুষ কর্মস্থলে যাতায়াত, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ভ্রমণ কিংবা উৎসব-পার্বণে নাড়ির টানে গ্রামের বাড়িতে ফেরার জন্য রেলপথকে বেছে নেন। এর পেছনে রয়েছে রেলের বেশ কিছু অনন্য সুবিধা।

প্রথমত, নিরাপত্তার দিক থেকে রেলপথ সড়কপথের তুলনায় অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। সড়ক দুর্ঘটনা যেখানে প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা, সেখানে রেলপথে দুর্ঘটনার হার তুলনামূলকভাবে খুবই কম। ফলে দূরপাল্লার যাত্রায় ট্রেনকে অধিক নিরাপদ পরিবহন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একই সঙ্গে ট্রেনে যাত্রা তুলনামূলক আরামদায়ক হওয়ায় শিশু, নারী এবং প্রবীণ নাগরিকদের কাছেও এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

দ্বিতীয়ত, রেলওয়ে দেশের সাধারণ ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য সবচেয়ে সাশ্রয়ী গণপরিবহণ। বাস বা অন্যান্য যানবাহনের তুলনায় ট্রেনের ভাড়া তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় সীমিত আয়ের মানুষও সহজে দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করতে পারেন। বিশেষ করে লোকাল ও মেইল ট্রেনগুলো গ্রামীণ জনপদের মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতের অন্যতম প্রধান ভরসা। শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা কিংবা কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে এসব ট্রেন লাখো মানুষের জীবনকে সহজতর করে তুলেছে।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের মহাসড়কগুলোতে যানজট একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। রাজধানীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে থাকা এখন নিত্যদিনের বাস্তবতা। কিন্তু রেল নিজস্ব ট্র্যাকে চলাচল করায় যানজটের কোনো প্রভাব পড়ে না। ফলে নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ট্রেন একটি সময়সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

রেলওয়ের অবদান শুধু যাত্রী পরিবহনেই সীমাবদ্ধ নয়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গেও এটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধিতে রেলওয়ের অবদান অনেক সময় সরাসরি দৃশ্যমান না হলেও এর পরোক্ষ প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী। বিশেষ করে ভারী ও বৃহৎ পরিসরের পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে রেল সবচেয়ে ব্যয়-সাশ্রয়ী এবং কার্যকর মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। কয়লা, পাথর, সার, খাদ্যশস্য, নির্মাণসামগ্রী এবং জ্বালানি তেলের মতো পণ্য কম খরচে এবং নিরাপদে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে দিতে রেলওয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও রেল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ঢাকার কমলাপুর অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো (ICD) পর্যন্ত কন্টেইনারবাহী ট্রেন নিয়মিত পণ্য পরিবহন করে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে গতিশীল রাখছে। এর ফলে পরিবহন ব্যয় কমছে, পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা দ্রুততর হচ্ছে এবং মহাসড়কগুলোও অতিরিক্ত ভারী যানবাহনের চাপ থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকছে। পাশাপাশি সড়কের ক্ষয়ক্ষতিও কম হচ্ছে, যা জাতীয় অর্থনীতির জন্য দীর্ঘমেয়াদে লাভজনক।

গত এক দশকে বাংলাদেশ রেলওয়েতে যে আমূল পরিবর্তন এসেছে, তা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। পদ্মা সেতু রেল সংযোগ চালুর ফলে ঢাকা ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগে বৈপ্লবিক

পরিবর্তন এসেছে। যাতায়াতের সময় ও দূরত্ব কমেছে, আর মোংলা বন্দরের সঙ্গে রাজধানীর সরাসরি রেল সংযোগ বাণিজ্য ও শিল্পায়নের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে। একইভাবে দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথ চালু হওয়ায় দেশের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেয়েছে এবং পর্যটন শিল্প নতুন গতি লাভ করেছে। যমুনা রেল সেতুও দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগকে আরও দ্রুত ও নির্বিঘ্ন করেছে।

পরিবেশ সংরক্ষণেও রেলওয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সড়কপথের তুলনায় রেলপথে জ্বালানি খরচ ও কার্বন নিঃসরণ কম হওয়ায় এটি একটি পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা। ভবিষ্যতে বৈদ্যুতিক রেলব্যবস্থা চালু হলে সবুজ অর্থনীতি গঠনে এর অবদান আরও বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে নগর যোগাযোগ ব্যবস্থায় মেট্রোরেল রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে এবং প্রতিদিন লাখো মানুষের সময় ও শ্রম সাশ্রয় করছে।

আঞ্চলিক যোগাযোগ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। ভারতের সঙ্গে একাধিক আন্তঃদেশীয় রেলপথে যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল করছে। পাশাপাশি ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে আঞ্চলিক বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

তবে এতসব অর্জনের মাঝেও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। দেশের অধিকাংশ রেলপথ এখনো সিঙ্গেল লাইনের হওয়ায় ট্রেন চলাচলে বিলম্ব ঘটে। ব্রডগেজ ও মিটারগেজের দ্বৈত ব্যবস্থা, টিকিট কালোবাজারি, অব্যবস্থাপনা এবং দক্ষ জনবলের ঘাটতিও রেলসেবার মানোন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এসব সমস্যা সমাধানে ডাবল লাইন নির্মাণ, একক গেজ ব্যবস্থা চালু, প্রযুক্তির আরও বিস্তৃত ব্যবহার এবং দক্ষ জনবল নিয়োগের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

সড়কপথের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমিয়ে রেলকে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে দেশের জ্বালানি ব্যয় ও যানজট উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। একই সঙ্গে গ্রামীণ ও নগর অর্থনীতির মধ্যে সুষম সংযোগ ও উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। রেলওয়ে শুধু একটি পরিবহণব্যবস্থা নয়, এটি অর্থনৈতিক অগ্রগতিরও শক্তিশালী চালিকাশক্তি। তাই বাংলাদেশ রেলওয়ের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ যত এগিয়ে যাবে, ততই বেগবান হবে দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির যাত্রা। বলা যায়, লোহার ট্র্যাক ধরেই বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে তার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ও অগ্রগতির গন্তব্যের দিকে।

#

লেখক: তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার